শাদ্বল ই-পত্রিকা পূজা সংখ্যা -১৪২৮
কার্ত্তিক -১৪২৮/ অক্টোবর ২০২১
শাদ্বল
কবিতা
ছড়া
ছোটগল্পের
সবুজ ক্ষেত্র
সম্পাদক:
নৃপেন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ:
সৌকর্ষ ভট্টাচার্য্য

শাদ্বল (পাক্ষিক ই-পত্রিকা) দ্বিতীয় সংখ্যা

অক্টোবর ২০২১/ কার্ত্তিক ১৪২৮

সম্পাদকঃ নৃপেন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য

শিবযজ্ঞ রোড , খাগড়াবাড়ি

কোচবিহার-৭৩৬১৭৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করঃ সৌকর্য ভট্টাচার্য্য

যোগাযোগঃ

Email: Shadwalpatrika@yahoo.com

Whatsapp: ৯৫৬৪৬৩২৪০৭

সুচীপত্রঃ

কবিতা:

ছড়াঃ

ছোটগল্পঃ

সম্পাদকীয়

২০০২ সালে 'শাদ্বল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তখন তা হার্ড কপি হিসেবেই প্রকাশ পেয়েছিলো। তারপর জীবনের নানা টানাপোড়েনে পত্রিকাটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ ঘুমে ছিলো আমাদের ভালোবাসার পত্রিকাটি। এখন নুতন কলেবরে জেগে উঠে পত্রিকাটি আবার যাত্রা শুরু করল সময়ের দাবি মেনে ই-পত্রিকা হিসেবে। আজ যখন এই পত্রিকাটি আবারও শুরু করছি তখন খুব মনে পড়ছে দুই জনের কথা যাদের উৎসাহ ও প্রেরণা আজ অবধি অন্তসলিলা ফল্গুর মতো এই পত্রিকার সাথে বাহিত। প্রথম জন কোচবিহারের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও লেখক মাননীয় অম্লান জ্যোতি মজুমদার মহাশয়, অন্যজন কবি বন্ধু ও দাদা মান্যবর রামকান্ত রায় যাদের দুজনেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। অমর্ত্য থেকে তাঁদের শুভাশিস ও শুভেচ্ছা অবশ্যই এই পত্রিকার সাথে থাকবে। সেই সাথে শুভেচ্ছা জানাই চিত্রশিল্পী বন্ধু অনিরুদ্ধ পালিতকে যে ঐ প্রথম সংখ্যাটিতে পত্রিকার প্রচ্ছদটি করে দিয়েছিলো, যে প্রচ্ছদের একটি অংশকে শাদ্বল পত্রিকা তার লোগো হিসেবে ব্যবহার করছে। বর্তমান ই-পত্রিকাটির পেছনে মূল উৎসাহ আমার ছেলে সৌকর্ষ ভট্টাচার্য্যর যে এই পত্রিকার এবারের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছে ও আমাকে নানা ভাবে সহযোগিতা করেছে। ওর জন্য অন্তরের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সব সময়ের জন্য। সেই সাথে সন্মান ও শুভেচ্ছা জানাই সব গুণী সাহিত্যসাধকগনের প্রতি যারা মূল্যবান লেখা ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে ও শাদ্বলকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে আসি শাদ্বল কি চায়। প্রথম সংখ্যাতেও বলেছি 'শাদ্বল' মানে 'কচি ঘাসে ঢাকা জমি', তাই শাদ্বল হোক প্রাণোচ্ছলতায় পূর্ণ, নবীন ঘাসের মতো সজীব। কোনো দল নয়, শাদ্বল হোক সবার জন্য মুক্ত। শাদ্বল সাহিত্যসাধকদের মধ্যে ছোটো-বড় ভাগ করে না, শাদ্বল মুক্ত অঙ্গন। তাই শাদ্বলের হলদেটে সবুজ ভূমিতে যেমন অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য সাহিত্যসাধাকদের লেখা রয়েছে, তেমনই রয়েছে নুতন লেখকেদের সমাগম। নুতনদেরও স্হান করে দেওয়া ছোটো পত্রিকার ভূমিকার মধ্যেই পড়ে। আমাদের এই সংখ্যায় তাই অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকগনের সাথে হাত ধরাধরি করে থাকছে তরুন সাহিত্যসাধকরা। এই সব মিলে শাদ্বল সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র হয়ে উঠুক, এই আশা রাখি।

এই পত্রিকার সকল শুভানুধ্যায়ীকে পত্রিকাটি পাঠ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে।

শুভেচ্ছান্তে

নৃপেন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক-শাদ্বল

২২/১০/২০২১

সম্মোহিত পাণ্ডুলি

উত্তম দত্ত

অনেক সোনালি মুহূর্ত ক্ষয় হয়ে গেছে

তোমার অহেতুক কাগজের প্রতিমা নির্মাণে...

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম উপমার এত ভয়াবহ অপচয়

একুশের রক্তে ধোয়া বর্ণমালার এমন শোচনীয় লাঞ্ছনা

বাংলাভাষার এতখানি খাণ্ডবদাহন এক জীবনে আর কখনও করিনি।

এযাবৎ যত চিঠি লিখেছি তোমাকে সে সব একত্র করলে

ভারতবর্ষের সমস্ত বিষণ্ণ আকাশ ঢাকা পড়ে যেত।

যত বার্তা পাঠিয়েছি রাত্রির ইথারে সেসব দুহাতে জড়ো করলে

অন্ধ কবি হোমারের তৃতীয় এপিক হয়ে যেত।

দুর্ভিক্ষের অন্ধকারে আমি দেখে ফেলেছি তোমার দাঁত নখ আর জিহ্বার ভাষা।

ফসফরাসের সম্মোহিত পাণ্ডুলিপি ঝরে গেলে আমি সবিস্ময়ে দেখেছি,

তুমি টিস্যু দিয়ে মুছে নিচ্ছ অষ্টম এডওয়ার্ডের স্মৃতি,

স্বপ্নময় উপকথা... এবড়োখেবড়ো বগলের ঘাম।

এখন এই অনাচারী অন্ধকারে

একা একা ফিরতে পারব না আর

ফেলে আসা ভগ্নস্তূপে, ঘোলাজলে প্লাবিত উঠোনে।

একটা সাদা ফাইবারের লাঠি হলে

এক মৃত্যুকূপ থেকে অন্য এক মৃত্যুকূপের দিকে হেঁটে যেতে পারি।

কিনে দেবে ? তোমাকে নিয়ে লেখা আমার সমস্ত গ্রন্থস্বত্বের বিনিময় ?

বার্ধক্য ভাতা

অমর চক্রবর্তী

'আমার উমার দন্ত মুকুতাগঞ্জন

বাঁয়ে লড়ে ভাঙা বেড়া বুড়ার দশন

উমার বদনচাঁদ পরকাশে রাকা

বুড়ার বিকট দাড়ি গোফ পাকা।।' অন্নদামঙ্গল

সেই যখন তোমার কাছে যাই

মুখ টিপে হাসে চাঁদ

প্রতিবেশিরা হরি নামের মত শোনাতে থাকেন

ওরে মনামী এই বুড়োই বুঝি পেতেছে

মায়া, প্রেমের ফাঁদ!

আমি মোহ -মটি শরীর সুখের ধানক্ষেত পেরিয়ে

তার কাছে যাই--

সে উর্বর শস্য ,চোখ মেলানোর দূর্বা, বর্ষার চারাগাছ

সে মুগ্ধতার শিশির ছড়িয়ে দেয় পুরাতনে

আমি থাকি শ্রবণ সুখে,আর আহ্লাদী গানে ...

তোমরা খুঁজবে এর মাঝে অপ্রেম, অশ্লীলতা

আমি বলে যাবো মনামী আমার ক্লান্ত মনের আশ্রয়

এই সুন্দর এই মুক্তো আমার বার্ধক্য ভাতা

লাশের স্তূপে বেওয়ারিশ লাশ

সেবু মোস্তাফিজ

লাশের স্তূপে নিশ্চুপ নিথর দেহ।

সুরতহালের সুযোগও হীন।

কাপড় সরালেই তবে পরিচয় নিশ্চিতকরণ

তবেই সিদ্ধান্ত দাফন না দাহ!

নির্জন রাস্তায় সারিসারি মরা বৃক্ষ।

হুল্লোড় নাই নাই কান্নার রোল

পালালেই যেনো বেঁচে যাবে

তাই পালালো প্রিয়জন।

কি হবে নির্জীব আমাতে?

কুকুরে টানছে শৃগালে খাচ্ছে পরিচয়হীনতা

এই মহামারিতে তবুও কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত দূর্জন।

তবুও উৎসব তবুও গদীর লোভ

তবুও মজুদদারর গুদামে শত বছরের সঞ্চয়

তবুও ধর্ম ধর্ম খেলা এবং

যুদ্ধবাজের বেসাতি চিতার লেলিহান শিখায়।

আমি ব্যাকুল! কি উপায় কিবা পরিচয়

রাম আর রহিম চেনা কি জরুরি নয়?

কেন আমায় নিচ্ছিস চিতায় কেন পোড়াতে চাস

আমি সাচ্চা মুসলমানের বাচ্চা রহমান নই ধর্মদাস।

এদিকে রামের সেকি আকুতি মিনতি করিস না দাফন

চিতায় দিলে স্বর্গে যাবো ধর্ম আমার সনাতন।

চিতা আর গোরস্থানে সিলগালা

যমদূত আসছে তেড়ে পালা সব পালা।

বেওয়ারিশ লাশ পচে গলে একাকার

রাম কিংবা রহিম কি উপায় জানার?

আশ্বিনে শারদপ্রাতে

সন্তোষ সিংহ

এই বানবারিশের দেশে মেঘের চাদর গায়ে

তুমি এলে আমার আকাশ

বুকে ভরে নিয়ে শত সূর্যোদয়

যেন পথহীন পথের মোকামে যত ছিল অসুখের মাস

ভালোবাসা-বিজুরি-ছোঁয়ায় দ্রুত পেলো যাদু নিরাময়

যেন আশ্বিনে শারদপ্রাতে জেগে উঠল যত শুভ্র কাশ !

জেগে উঠল মহাচৈত্রে বৈশাখে অমর্ত্য ধূলির আলোর চরণ

যেন আধি ব্যাধি অন্ধের মুছে দিতে জ্যোতিরাবরণ ।

অশান্ত বসে আছি

নৃপেন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য

লালচে জল ছুঁয়ে উঠে দু-হাত-

রক্তের শেষ আভা লেগে থাকে তবু-

শিশুর বিস্ময় মরেছে মনের ভেতরে-

উদ্দেশ্যশূণ্য আনন্দেরা শায়িত কবরে-

কল্প মেঘদূত নয়কো মেঘ-

নৈ:শব্দে নিশি ডাকা ভয়-

দাম্পত্যের মুগ্ধ বিস্ময়ও মরেছে একান্ত রাতে-

শ্মশানে শায়িত উত্তর-মাথা অস্হির সময়-

কতজন চলে গেছে অন্তিম পথে-

কতজন চলে যাবে আরও নির্দায়-

অবিচার-ক্ষুধা-মৃত্যু-ধুন্ধুমার-

মরা-বাঁচা, রেসারেসি- সংসার অন্তত হাপর-

তবু নিস্বর্গ স্বর্গের মতো অবচেতনে-

যদি শিশুর সহজ চোখ বাঁচে চোখে-

বিস্ময়ে দেখি চেনা শালবন- বাবুই ঝাঁকে ঝাঁকে-

মরা-তোর্ষাও কি খেয়ালে দেখি বিস্ময় লিখে রাখে-

শিশুর বিস্ময় মরেছে ম নের ভেতরে-

বুঝে গেছি লাভ নেই মেঘে চিঠি পোস্ট করে-

বুঝে গেছি 'আকাশ ভরা সূর্য তারায়'সে বিস্ময়ও নেই-

শুধু অশান্ত বসে আছি নিজের ধূসর কুয়াশায়।

সাঁতার

সুবীর সরকার

সাঁতার কাটবে বলেই তো জলে নামে হাঁস

এদিকে টানা বারান্দার গল্প।

রেললাইন পেরবে হাতিরা।

শালকাঠের নৌকো বৃষ্টিতে ভিজলে

করাতকল থেকে ভেসে আসে মনখারাপেরা

নদীমাতৃক এই দেশ শস্যের গন্ধে ভরে যায়

চাঁদের নিচে জেগে থাকি।

ডটপেনে চন্দ্রকথা লিখি।

বীজধান

রাজীব দে রায়

ক্রমশ পরাগরেণুর মত হালকা ভেসে যাই,

অনেক অলিগলি পেরিয়ে

গভীর অন্ধকারে

রাতপাখিটির তীক্ষ্ণ নখে ঝুলতে থাকি।

আমি চাই, পাখিটি উড়ে বেড়াক দূর-দূরান্তরে,

যে সব নদী আমাদের দিয়েছিল

সভ্যতার প্রথম পাঠ ;

তাহাদের বুকে আমাকে নিক্ষেপ করুক,

ক্রমশ জল হয়ে চলে যাব শস্যক্ষেতে বীজধানের ভিতর...

ধর্মের গতি যত সূক্ষ্মই হোক না কেন,

আমি জানি -- যাহা ধান, তাহাই ধর্ম ॥

দেহদাহ

শৈবাল মজুমদার

এই দেহ এই দাহ অনুক্ষণ দাবানল জ্বলছে জ্বলছে

গলায় গামছা বেঁধে কবে যে ঝুলবে একা

পীতভোরে মরা নিম গাছে

বিছানা বালিশ ভেঙে

ভেঙে ফেলে মালভূমি আর স্তম্ভসম উরু

রাত্রি নিশীথ ভেঙে এ শরীর জেগে ওঠে গুরু গুরু গুরু

আঁশটে গন্ধ মাখা প্রেম যে সময়

শিয়রে দাঁড়ায় এসে প্রেতযোনি যেন...তখন পুরুষ জেনো

গভীর ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে শোয়

বাঁহাত বাড়িয়ে তার মা'র স্তন খোঁজে...মা'র স্তন

প্রৌঢ় রুঢ় সময়ের এই খরস্রোতে

পৃথিবীর নাড়ি থেকে কবিতার নাভি যদি

ছিন্ন করে দাও কোন নিষ্ঠুর প্রাতে

প্রাচীন স্থাপত্য কাঁপে প্রসব বেদনায়

কেঁপে যায় বিশ্বাসের সকল প্রস্তর

বৃক্ষও প্রতিদিন উন্নত হয়...সজীব সবুজ হয়

মলিন শরীর মুছে

প্রশাখা বাড়ায় পূবে আলোকণা ছুঁতে

আমাকে বৃক্ষ করে দাও...হে প্রভু

আমাকে বৃক্ষ করে দাও

অন্তহীন প্রথম শরৎ

মহুয়া রুদ্র

জন্মদিনে অশক্ত হাত দুলিয়ে অসম্পূর্ণ মুষ্টিতে

দাবী করেছিলাম, তোমাকে দেখতে চাই

একবার, অন্তত একবার, অনিন্দ্য রূপে।

আজ যখন স্মৃতির পাতা হলদেটে

তখনও নবজাতকের মত অর্ধোন্মিলিত চোখে

প্রতিবার প্রথম দেখি

তোমার পারপ্লাবনী রূপ, তোমার কোমল চাহনি

শরীরী শুভ্রতায় শ্যামল গভীরতা,

খোঁজ পাই তোমার অন্তরে উৎসবের ছন্দ।

টের পাই এক সাবালক ঘোড়া নেচে উঠছে

এক পক্ষীশাবক ডানা মেলছে আকাশের দিকে

দিগন্ত ছুঁয়ে যোগ দিতে স্বাধীনতার উৎসবে।

এ উৎসব বাঁধন হারার উৎসব

কাশের বনে নিজেকে রচনা করার উৎসব

শ্রান্ত নদীর বুকে

বেখেয়ালে খসে পড়া মেঘের ছবিতে

নিজেকে মেলে ধরার উৎসব।

মেলে ধরি নিষ্কলঙ্ক হৃদয় পেলব ভাষ্যে

মেলে ধরি নীলাভ দৃষ্টি নোয়ানো কাশে

নিসর্গের শারদ রোমাঞ্চে সিক্ত সুবাসে

মেলে ধরি তৃষ্ণাকাতর মন ভেজা ঘাসে।

স্রোতান্তর

হরিদাস পাল

ভিখারিটি একটানা বাজিয়ে চলেছে দোতরা।

চারপাশ শুনশান, তবু মিষ্টি মধুরে দোতরা ।

ভিখারিটি ভাবল, শহর কি মৃত? নাকি মাটির

গেঁথে থাকা সুর অপছন্দ?

আমি যে শিকড়ের সুর ছাড়া কিছু জানি না,

শিকড়ই আমার বেঁচে থাকার শ্বাস-প্রশ্বাস।

তবে কি এখানে আমার থাকা চলবে না?

মাটি যে বলেছিল শহরে যাও, মাটির শিকড়ের

সুর বাজাও, গাও, অভাব হবে না।

এক এক করে স্পষ্ট হল এ শহর মৃত, নেই কোন

মাটি, নেই তার শিকড়, নেই প্রাণ।

মাটি কি মিথ্যে বলেছিল? তা বলবে কেন? মাটি মিথ্যে বলে না।

হয়তো অনেক আগে শুনেই আশার আলো শুনিয়েছিল।

মাটি জানে না শহর বিক্রি হয়েছে আজ

সুরান্তরের কাছে ,তার শিকড় এখনও পৌঁছায় নি শহরে।

না না, এখানে আর নয়, মাটির কাছেই চলে

যাব ; ছেড়ে যাব সেখানেই আমার শেষ নিঃশ্বাস।

লাবণ্য মাখা প্রচ্ছদপট

সঞ্জয় সোম

আকাশে রোদ উঠেছে

শিউলি ফুটেছে গাছে

লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে

তোমাকে "x" মনে করে লিখত মন চায় না

তোমার নতুন শাড়ি

পিঠ পর্যন্ত খোলা চুল, রাঙা ঠোঁট

এরপর "x" কবি ভাবে কী করে ? না দেখে পারে কবি !

তোমাকে ভেবে ভেবে আপন মনে কবি লেখে তোমাকে

এঁকে রাখে লাবণ্য মাখা তোমার মুখের প্রচ্ছদপট

ফিরিঙ্গি বাতাস

কল্যাণ দে

যত দিন ঢলে মোম গলনে

পাতা খসে ন্যাড়া হয় মাকড়সার জাল

মিষ্টি নামের সেই মেয়েটা

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফিরে গেছে কোথায়

হা-হুতাশের শব্দে সাজিয়ে কিশোর যৌবন

রণপায়ে পিচ্ছিল ভূমি চষে ফিরি ফিরিঙ্গি বাতাসে।

অভিমান

নরেশ মল্লিক

উলঙ্গ কচি কচি ঘাসগুলো অর্ধমৃত হয়ে পড়ে আছে।

নির্যাতিতা পাপড়িগুলো ঝরে পড়ার অপেক্ষায় দিন গোনে অনবরত।

অভিমানের অন্ধকার জমা হয় ছোট্ট ঘুপছি গলিপথের আনাচে কানাচে।

তোমার খুশির ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ুক মুখ থুবড়ে পড়া কান্নার পাঁচিলে।

অভিমান আর অভিমান জমে জমে ক্ষিদের স্তূপ তৈরি হয় দীপ না জ্বলা কুঁড়ে ঘরে।

আধখানা রুটি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রতিশব্দ বয়ে যায় গড়িয়ে চলা সভ্যতার জলস্রোতে।

কান্নার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে চায় পরিত্যক্ত ডাস্টবিনে --

পড়ে থাকা যন্ত্রণাগুলো পা মেলায় শেষ যাত্রায়

আর অভিমান ছড়িয়ে পড়ে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো।

রূপকথা দীপ জ্বালে

রবীন বসু

প্রচ্ছন্ন শিকড় থেকে যে জলের উৎসার

তার অভিমুখ বৃক্ষ লালন করে;

গূঢ় গোপন যাত্রার এই মিহি চাল

অন্তর্নিহিত প্রসন্নতা আর প্রয়োজনকে

কুর্নিশ জানায়; পরস্পর সংলগ্ন ছায়া

এ ওর দিকে তাকাতে তাকাতে যেমন চলে যায়

নদী বরাবর, ফেরিঘাট অতিক্রম করে

আর অজানা দেশের দিকে ঢেউ ওঠে

প্রাণপন লড়াই আগ্রহকে বাঁচিয়ে রাখে

তবু চমৎকার দিনাবসান সন্ধ্যার শঙ্খের গায়ে

দিনলিপি লিখে রাখে কুহক জড়ানো এই

মায়া অন্ধকার, রূপকথা দীপ জ্বালে তুলসী তলায়!

জীবিতবৎ

উৎপলেন্দু পাল

আমি স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে আছি

সহস্র যুগ ধরে ঠায়

পদতলে চলমান পৃথিবী

ঘূর্ণায়মান যুগান্তর কালান্তর

দূর থেকে হাত বাড়ান ত্রিশঙ্কু

সকাল সন্ধ্যা নিশায়

বরাভয় মুদ্রায় মৃদুহাস্যে

কালচক্রে অধিষ্ঠিত মহাকাল

অনন্ত ষড়রিপুর বাস

আমার দ্রাঘিমা পরিক্রমণে

সপ্তাশ্ববাহন জবাকুসুম মিহির

এখনো স্থির সহোদর ধ্রুবতারা

উপেক্ষা করে আকাশ

অপলকে শুধু তাঁকেই দেখা

অনন্তকাল ধরে যুগপৎ জড়বৎ

আমিও মৃতবৎ জীবিত রয়েছি

সালান্তর বা জন্মান্তর

আমার প্রতিবেশী তিনিও

অযোনিসম্ভব সর্বব্যাপী ঈশ্বর ।

ভূষণ হীনা

বন্দনা পাত্র

রূপকথার রূপকাহিনি গোপন রেখে

মজবুত সব শব্দ গুলো ভূষণহীনা শাসন ঢাকে।

জীবন চলে একাকীত্বে আপন ভুলে

পঞ্চমী চাঁদ দিচ্ছে উঁকি আকাশ তলে,

বাগদী বধূর রূপকথা তো মাঠে ঘাটে

তিনখানা আধপেটা পেট ক্ষিদেয় জ্বলে

রূপকথা কি সিঁদুর প'রে বধূর জোটে?

আঁধার ভোরে হাটে চলে পুরুষ শাসন নিঠুর হ'লে।

জীবন যাপন হালকা ঘুমে অষ্টমীতে প্রদীপ জ্বালে

দূর্গা পুজোর সন্ধি পূজায় মানত করে।

ভূষণহীনা অঙ্গে শুধু শাড়ি প'রে লাল পেড়ে।

আনন্দে চোখ ছলছল্ দূর্গা মা এলে

হাতজোড় করে"কষ্ট দূর করো"বলে।

বিপ্রলব্ধ

সুদীপ্ত বিশ্বাস

ত্র্যহস্পর্শে তিথিক্ষয়ে চাঁদের দেখা নেই

মঞ্জুষাতে লক্ষ্মীকে নয়, চাইছি তোমাকেই।

তামরসের মতোই তুমি, মুগ্ধ হয়ে থাকি

ধৈবতহীন আরোহণে তিলক কামোদ রাখি।

অনিকেত শব্দচাষী বন-পাহাড়ে ঘুরি

স্মিত হাসির ময়ূখছটায় মন করেছ চুরি।

ভৈরবের ওই বিরহী সুর পাখির ডাকে ঝরে

বিপ্রলব্ধ, বিহানবেলায় বড্ড মনে পড়ে।

শূন্য পথে

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

যে পথ দিয়ে গিয়েছো অনেক দূরে

ওই সবুজ নদীর পাড়ে

শূন্যতাকে সাজিয়ে রেখে জলতরঙ্গ সুরে

ভালোবাসা সেখানে কি মেঘের ডানায় ওড়ে !

এক আঁজলা বৃষ্টি ভরে এনো যদি

অশ্রুতে কম পড়ে ।

ছড়ার ঘড়া

ছ ড়া র ছ ড়া ছ ড়ি

বাঘের ল্যাজেই পা

গৌতমী ভট্টাচার্য

কাল তো যা এক কান্ড হল
বলব কি আর তাই
নদীর ধারে বাঘ দেখেছে
গল্টুদাদার ভাই।

জাল পেতে বাঘ আনতে বাগে
নদীর বালুচরে -
বাঘটা তো ভাই লুকিয়েছিল
হাবুর দোকান ঘরে।

এইবারেতে কান্ড হল
চালের বস্তা ভেবে
যেই না হাবু টানতে যাবে
বাঘটা গেল রেগে।

গড়ড় ঘড় ! গড়ড় ঘড় !
শব্দ কেন হয়?
হাবুর চোখে বিশ্ব তখন
ঘোর কৃষ্ণময়।

হুড়মুড়িয়ে যেই পালাবে
বাঘের ল্যাজেই পা
আর্তনাদে উঠল কেঁপে
সারা শহর-গাঁ।
হাবু এবার বাঘের পেটে
গেলই বুঝি চলে
বাঁচার আশা নেই কোন আর
বাঘের গায়ের বলে।

লম্বা পায়ে ছুটছে হাবু
যাচ্ছে বহুদূর --
যাচ্ছে কোথায় নেই কোন ঠিক
গলায় আর্তসুর।

ছুটছে হাবু-- ছুটছে হাবু--
ছুটতে ছুটতে শেষে
মস্ত বড় গাছের গোড়ায়
থমকে দাঁড়ায় এসে।

বাঘটা এবার পেছন থেকে
কামড়ে দিল জোর
কামড় তো নয়-- মায়ের হাতের
বিশ মণ থাপ্পর !

মার খেয়ে জোর ঘুম ভেঙে সে
চোখটা মেলে দেখে
বালিশ-চাদর লন্ড ভন্ড
খাটটা গেছে বেঁকে।

বাঘটা তবে কোথায় গেল
স্বপ্ন ছিল সব?
মায়ের হাতের আর এক চড়ে
জুড়ল কলরব।

বৃষ্টি মুখর মন

সুব্রত কুণ্ডু

সকাল থেকে বৃষ্টি-নাচন

একটানা আনন্দ,

দ্বারের কপাট বন্ধ,

রিনিঝিনি কিঙ্কিনী রব

মনোহর তাল ছন্দ।

মনের কপাট খোলাই আছে,

ঘরের জানলা খুলে -

উঠল যে মন দুলে,

মুগ্ধ নয়ন - প্রাণ জুড়ানো

প্রথম কদম ফুলে।

চোখ ধাঁধানো তড়িৎ ছটা

ওঠে আকাশ - কোলে

বক্ররেখায় ঝ'লে,

গাছগাছালির ফাঁকে দেখেই

আনন্দে মন দোলে।

গুরুগুরু মেঘের ডাকে

শিহরণে বুক

করে যে ধুকপুক,

হোক সে ভীষণ--ওরই মাঝে

রোমাঞ্চকর সুখ।

মন-নদীতে কূল ছাপিয়ে

ওঠে খুশির ঢেউ,

জানলা দিয়ে আমি দেখি--

আর দেখে কি কেউ।

শরতের কোল জুড়ে

সুভাষ চন্দ্র রায়।

টুপটুপ রাতভর,শিশিরের শব্দ,

বাংলার তৃণভূমি,উচ্ছ্বাসে অদ্য!

হিম হিম হাওয়াতে,শিউলি সুবাস,

ঘন ঘন দোল খায়,প্রিয় সাদা কাশ!

হাঁসগুলো দলে দলে,পদ্মপুকুরে,

ভেসে চলে আনন্দে,খুশি ডুব সাঁতারে!

কথা কয় গান গায়,প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক,

পানকৌড়িও বলে,'আমাকেও দ্যাখ!'

সারাদিন জলে থাকি,খেলি ডুব সাঁতারে,

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরি,মাছ নিয়ে ঠোঁটে রে'।

শালুক পদ্ম দেখে,চোখ মেলে আকাশে,

মজে মন খুশিতে,শরতের বাতাসে!

ঢাক বাজে কাঁসি বাজে,ওঠে শঙ্খধ্বনি,

মণ্ডপেতে শোভা ছড়ায়,দুর্গা ঠাকুরানি।

অতসী অপরাজিতা,দূর্বা বেলপাতায়,

প্রিয় ফুলে মা দুর্গার,আরাধনা হয়।

ভক্তজনে মগ্ন পূজায়,পুষ্পাঞ্জলি দেয়,

করজোড়ে প্রার্থনায়,মায়ের আশীষ নেয়।

'মানুষের ভালো হোক,মা তোর বরে,

খুশি সুখ আনন্দ,হোক ঘরে ঘরে'!
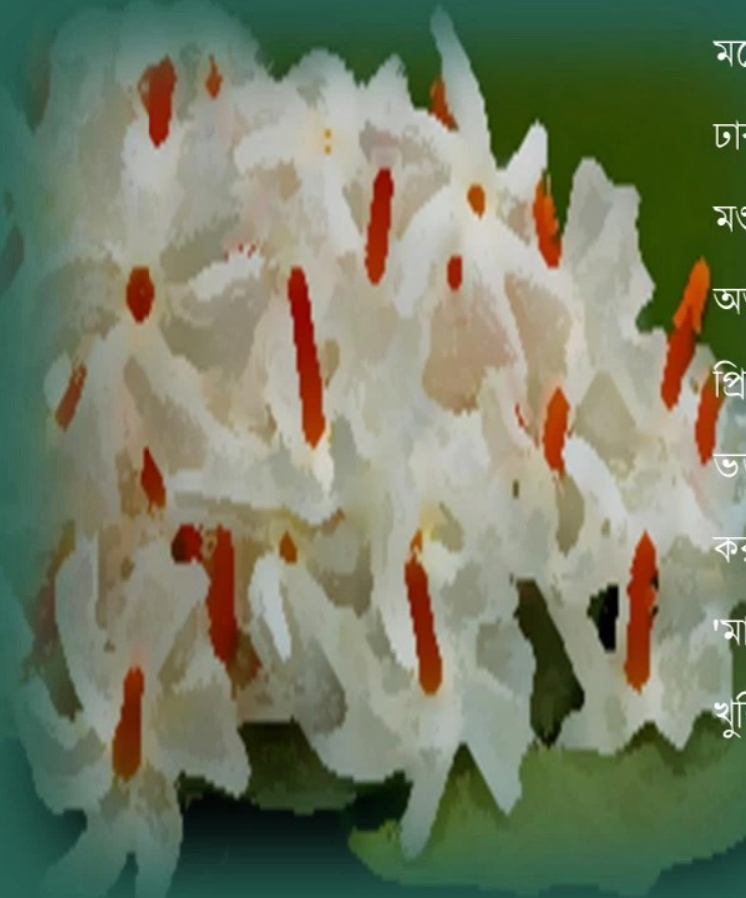
দিলেরগঞ্জের অভিশাপ

সৌভিক নিয়োগী

ঘটনাটির সূত্রপাত ১৯২০ এর দিকে । রহিমের বাবা মোহাম্মদ তারেক মিঞার চেষ্টায় ব্রিটিশ পুলিশের আন্ডারে রহিম একটি চাকরি জোগাড় করল । বলাবাহুল্য ছেলের এ হেনো উন্নতিতে বাবা খুব খুশি, কিন্তু সেই খুশি তে অতিশীঘ্রই বাঁধ সাধলো যখন লর্ড বেথুন তাকে জরুরী তলব করলো ঢাকা শহরের সদর দপ্তরে ।অনিচ্ছা সত্বেও বাবার আদেশে সে ঠিক তার পরের দিন হাজির হলো সদর দপ্তরে । লর্ড বেথুন তাকে ডেকে আনলেন নিজের কেবিনে । সে কেবিনে ঢুকতেই দেখে একজন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছে । অতঃপর বেথুন সাহেব তাদের বলল - এই যে রহিম বাবু তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই,"ইহা হলো,মানিক গাঙ্গুলি।তোমাদের এখানে ডাকার কারণ একটা বিশেষ আছে, তবে তা বলিবার আগে এক কাপ চা খেয়ে নেন। এরপর বেথুন সাহেব চায়ের কাপে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলল।দেখো এখান থেকে প্রায় 50 মাইল দূরে দিলেরগঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে। সেখানকার পুলিশ সুপার মেহেদী সাহেব কিছুদিন হলো আশ্চর্য ভাবে মারা গেছেন, এছাড়া গ্রামের কিছু লোকও নাকি হারিয়ে যাচ্ছে ।তোমাদের সেখানে পাঠানো হচ্ছে সেটার বিস্তারিত ইনভেস্টিগেশন করতে, আর আমাকে রিপোর্ট দিতে । কি করতে পারবে তো?" মানিক জানায়, "হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই পারবো , আপনি বিশ্বাস রাখুন।"এই বলে তারা কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। এবার মানিক রহিম কে উদ্দেশ্য করে বললো, "তা কি বুঝলেন রহিম বাবু ।" রহিম সবিনয়ে জানালো,"আমরা তো একই বয়সী, আমাকে বাবু বলো না প্লিজ।" এবার মানিক হা হা করে হেসে উঠলো। রহিম বললো –"পুলিশ যখন মরেছে, তাহলে কি সপ্রদায়িক?

কথাটা শেষ করার আগেই মানিক বললো - "ওই এক বিষাক্ত রোগে দেশটাই শেষ হয়ে গেলো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দাঙ্গা, কি বলো ?" রহিম বললো ,"দেখো মানিক, এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করলে কিছুই বেরোবে না, ছোট থেকে মাঝে মধ্যে বানুর্জ্জে জেঠুর বাড়ি নাড়ু খেতে যেতাম । ও দাঙ্গা কস্মিন কলে দেখিনি এখনো।"

সহসা তাদের কথোপকথনে ছেদ পড়ল যখন এক পুলিশের গাড়ির ড্রাইভার এসে হাঁকাহাঁকি করতে থাকে - "কই গো রহিম বাবু, মানিকবাবু যাবে না,সাহেব আপনাদের জন্য এ গাড়ি খানা করে দিয়েছেন ।এবার আপনারা চাপুন দেখি।" রহিম আর মানিক এবার গাড়িতে উঠে বসলে গাড়ি বুম বুম করতে করতে চলতে শুরু করলো। আসলে সেকালে তো এত ফাস্ট কার ছিল না। যা ছিলো তা দিয়ে ৫০ মাইল যেতে তো প্রায় গভীর রাত হয়ে যাবে।

এবার অবিরাম কিছুদূর যাবার পর গাড়িটি একটি হুস শব্দ করে থেমে গেলো। মানিক কারণ জানতে চাওয়ায় ড্রাইভার বললো ,"বাবু খিদে লেগেছে গো , কিছু খাওয়াবেন নি?"রহিম বললো, "মানিক আমরা তো ঘোর অনর্থ করে ফেলেছি । ওর খাবারের ব্যাপারটা খেয়ালই ছিল না । চলো চলো ড্রাইভার ভায়া, ওই যে দূরে দোকান আছে গিয়ে দেখি কি জোটে।" দোকানে পৌঁছে খাবার অর্ডার করে তারা যখন কেস নিয়ে আলোচনা করছিল তখন দোকানি দিলেরগঞ্জ নামটা শুনেই আটকে উঠলো। মানিক বেপারটা লক্ষ্য করে বললো - " এই যে মশাই,

দিলেরগঞ্জ শুনে আপনি চমকালেন যে বড়ো ! কিছু জানেন সেখানে কি হচ্ছে তা নিয়ে?"

দোকানি এবার আমতা আমতা করে বলল ,"বাবু, আজ্ঞে ওখানে যাবেন নি বাবু।"

রহিম - "কেনো কি আছে সেখানে?"

দোকানী বললো, "বাবু ও গেরামটা ভালো নয়,ও গেরাম অভিশপ্ত ,শুনেছি নাকি পুরনো অভিশাপ আবার জেগে উঠেছে ।"

মানিক বাকিটা জানতে যাবে তার আগেই দোকানি ভেতরে দৌড় দিল। অগত্যা তারা খাওয়া শেষ করে গাড়িতে চেপে আবার রওনা দিলো। এরপর দিলেরগঞ্জে তারা যখন পৌছালো তখন প্রায় রাত নটা । গ্রামটা বড়ই আদ্ভুত নিস্তব্ধ এবং শান্ত, যেনো সারা পৃথিবী থেকে কেটে একে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সাথে একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ। ড্রাইভার পুলিশ ফাঁড়ির সামনে গাড়িটা এনে দাঁড় করালো, আর ঠিক তখনই একজন বুড়ো গোছের লোক দৌড়ে এসে পেন্নাম ঠুকে বললঅ, "আজ্ঞে বাবুরা, আমি এ থানার কন্সটেবল, আপনারা আসছেন, তাই আপনাদের জন্যেই বসে আছি, তা না হলে কি আর এখানে থাকি এই সময়। "

রহিম - "কেনো থাকতে কি ভয়? আরে আপনি তো পুলিশের লোক?"

"না বাবু, সে যতই ..., ছাড়ুন তো, ওসব কথা পড়ে হবে খন। আসুন আপনারা ভিতরে আসুন , আমি রান্না করে রেখেছি । আপনারা চান সারলেই আমি বেড়ে দেবো "। আসলে অত জার্নি করে তাদেরও মন ছিল না মেলা বক বক করতে। তাই তারা ঝটপট স্নান সেরে গরম ভাত আর মাংস খেয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লো। রহিম আর মানিককে একটা রুম দিলেও তাদের জন্য আলাদা আলাদা ছোট দুটি খাট বরাদ্দ।

2

পরের দিন ভোরে প্রচণ্ড কলরবে তাদের ঘুম ভাঙাতে তারা জানতে পারলো ,পাশের গফুর মিয়ার ছেলে কাল রাত থেকে উধাও। আর চার পাশের যা অবস্থা তাতে তার বাড়ির লোক রাতে খুঁজতে বেরোতে যাওয়া সমীচীন হবে না বলেই ভাবে নেন।

সকালে সূর্য উঠতে তারা দল বেধে এসেছে। আর কেনই বা আসবে না বলুন তো, এই নিয়ে মোট ৯ জন হলো যারা বেমালুম উধাও হয়ে গেছে । এরকম চলতে থাকলে তো গ্রামটাই জনশূন্য হয়ে যাবে। মানিক আর রহিম এবার গ্রাম বাসীদের আশ্বস্ত করল যে তারা যখন এসেছে এই ঘটনার শেষ তারা দেখে ছাড়বে। ব্যাস যেমন বলা তেমন কাজ ,কিছুক্ষনেই তারা রেডি হয়ে প্রাতরাশ না সেরে বেরিয়ে পড়েছে। বুড়ো কনস্টেবল জানতে চইলে তারা স্পষ্ট জানিয়েছে ,যে গায়ে ৯ জন উধাও ,আর ১ পুলিশ মৃত সেখানে তারা আরাম করতে আসেন নি। অতএব খাওয়া দাওয়া পরে। রহিম আর মানিক এবার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলো। কিন্তু বিশ্বাস করুন সারা দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনো কূলকিনারা তো তারা করতেই পারলো না, তার উপর গোদের উপর বিষফোড়া হলো ক্রাইম স্পট, মনে যেখান থেকে ভিকটিম উধাও হয়েছে ।

প্রত্যেকটি মাটির বাড়ি এবং প্রত্যেক স্পট এ মাটির কিছু জায়গা এবরো খেবড়ো , অগত্যা লোক ডেকে কোদাল চালানো হলো। কিন্তু না কোথাও কিছু নেই । সন্ধ্যায় ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তারা যে যা পেয়েছে একে অপরজনকে বলতে শুরু করলো। না ভিকটিমদের মধ্যে কোনো লিংক নেই , না বয়স এর,

না কাজের। তবে কেনো? লিংক বলতে ওই যে বাড়ি গুলো।

এরপর ডাক পেলো বুড়ো কন্সটেবল, সে এসে যা বললো তাতে নতুন উর্দিধারীদের চক্ষু চড়কগাছ।

ব্যাপারটা ঠিক এইরকম, এই গ্রামে বহু বছর আগে রঘুসর্দার নামের এক ডাকাত ছিল। সে নাকি নিজের দল বল নিয়ে থাকতো এই গ্রামেই,আর নিজেদের লুটের মাল তারা লুকিয়ে রাখতো গ্রামের কবর স্থনের মাঝে যে বট গাছ আছে তার নিচে। এই ভাবে ভালই দিন কাটছিল। সমস্যা হলো ,রঘুসর্দার তার ছেলের বিয়ে দেয় পুরোহিত সাহেবের মেয়ের সাথে জোর করে। তাতে পুরোহিত সাহেব রেগে ছিলেন কিন্তু তার রাগের বাঁধ সেদিন ভেঙে যায় যখন মোল্লাসাহেব, যিনি ছিলেন তার খুব ভালো বন্ধু, জানান যে , রঘুসর্দারের অত্যাচারে মুসলিমদেরও নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। শেষে এ গ্রাম কে বাঁচাতে তারা দারস্ত হলেন ব্রিটিশ সরকারে কাছে। অতঃপর একদিন গভীর রাতে লুটের পরিকল্পনা করে রঘুসর্দার এর দল যখন বট গাছের তলায় জড়ো হয় তখন পুলিশের অসস্মিক গুলিতে তারা সেখানেই লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু মৃত্যুর আগে রঘুডাকাত বলে যায় ,এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি সে এই পুরো গ্রামকে দেবে। তাদের মৃত দেহ গুলো চাপা দেওয়া হয় সেই বট গাছটাকে কেদ্র করে। পারে সেখানে কবর স্থান বানানো হয়।

পরবর্তী কালে প্রায় ৩৮ বছর পরেও সেখানে লোকেরা কবর দিলেও, সেই বট গাছটা থেকে তারা থেকে প্রায় ৩০ ফুট দূরত্ব বজায় রাখে। এরপর মেহেদীসাহেব এলেন এখানকার থানায় ইনচার্জ হয়ে। সব ঠিক থাক চলছিল। সমস্যা হলো মেহেদীসাহেব এ ঘটনা জানতে পারলেন গ্রামের লোকের মুখেই এবংতিনি ভাবলেন লুটের ধন আবিষ্কার করে ব্রিটিশ সরকার কে ফেরত দিলে তিনি বাহবা পাবেন ,সাথে কিছুটা ভাগও পেতে পারেন। সেই লোভে এক নির্জন রাতে তিনি হাজির হন সেই বট গাছের তলায়। তারপর আর কিছু জানা নেই। পরের দিন হারান জেলে তার দেহ সেই গাছ থেকে ঝুলতে দেখে থানায় খবর দেয়। তার পরের গল্প তো সবার জানা।

৩

এবার মানিক খেঁকিয়ে ওঠে বুড়ো কন্সটেবলের দিকে ,"ইয়ার্কি মারা হচ্ছে, এরকম বুজরুকি শুনিয়ে তুমি ভেবেছো ইনভেস্টিগেশন থামিয়ে দেবে?কেনো, কি স্বার্থ তোমার বলো? নিশ্চয় তোমরা সবাই ওই লুটের মাল হাতিয়ে মেহেদীসাহেব কে মেরেছো?"

এবার কন্সটেবল বললো,"কি বলেন স্যার ! আমি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, এই গ্রামের বিভিন্ন পূজায় আমার ডাক পড়ে। আমি খুন করবো?"

রহিম বেগতিক বুঝে বললো," আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও।"

এই যে মানিক এর ওপর রাগ করে কি হবে? কেসটার কি করবে বলো। এ সল্ভ না হলে তো আমাদের চাকরি থাকবে না।"

মানিক বলল - " তা তো বটেই। কাল গিয়ে একবার গাছটাকে দেখে আসতে হবে বুঝলে রহিম।"

পরের দিন রহিম আর মানিক হাজির হলো, কবরটা ভালো করে ঘেঁটে দেখলো। তবে গাছটার নিচে যেনো খোঁড়া আছে একটু। যেহেতু সাথে আর কিছু ছিল না তাই তারা ফিরে এলো গ্রামে। এবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে , আতঙ্কিত জনতা তাদের দিকে ক্ষোভ উগড়ে দিলেও সেই রকম সহায়তা কেউ করতে পারলো না। অগত্যা মানিক রহিম কে

বললো,"ভাই চলো তো বট গাছের নিচটা খুঁড়ে দেখে আসি।"

রহিম - "এ কি বলছিস ভাই ,পাগল নাকি।"

মানিক এবার রেগে বললো,"যেটা বলছি কর,তাড়াতরাতারি, বাড়ি যাবি তো।"

রহিম বললো,"মানে ?"

মানিক বললঅ,"শোন গাছের নিচে কিছু পেলে সেটা বেথুন সাহেবকে দিয়ে বলবো এই খাজনা লুকানোর চেষ্টায় গ্রামবাসীরা মেহেদী বাবু কে খুন করেছে ,আর সেই লুটের ধন নিয়ে নিজেদের মধ্যে বচসা থেকে নিজেদের মধ্যে খুনখুনি,ব্যাস কেস খতম। তারপর আমরা যে যার বাড়ি।" রহিমেরও মুখে হাসি ফুটলো। আগেই জানা রহিমের আসার ইচ্ছা না থাকলেও বাবার জন্য আসতে হয়েছে ।

এই ভেবে দুইটা কোদাল নিয়ে তারা কবর এ এসে একটু সাবধনে বট গছের নিচটা খুঁড়তে শুরু করলো। অনেকটা খোঁড়ার পর কিছু একটাতে তাদের কোদাল ধাক্কা খেল। দেখলো সেটা একটা সিন্দুক। এই তো , এই তো সেই খাজনা। ব্যাস তারা সেটা খুললো এবং মানিক কিছু স্বর্ণ মুদ্রা ভরে নিলো নিজের পকেটে।

তারা যখন গ্রামে ফিরে আসতে গেলো হটাৎ আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে গেল,বাজ পড়তে লাগলো। বৃষ্টি মাথায় তারা থানায় ফিরে দেখলো ,কন্সটেবল বাবু চিন্তিত হয়ে বসে আছেন। তাদের দেখে তিনি এবার ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলেন,"কোথা থেকে আসছেন আপনারা। এই দুর্যোগ বড়ই চেনা আমার,মেহেদী সাহেব যেদিন বট গাছের নিচটা খুঁড়ে ছিলেন সেদিনও ঠিক এমনি ঝর হয়েছিলো ।সত্যি করে বলুন বলছি।" এবার মানিক একটু বিরক্ত হয়ে বললো ,"আরে মশাই যান তো, দুটি কয়েন নিয়েছি তাতে কি হবে? সরুন সরুন কেস টা ক্লোজ করতে হবে। "

কন্সটেবল বাবু চমকে উঠে বললেন," হায় ঈশ্বর এ কি করলেন? এক মেহেদী সাহেবের কর্মের দাম দিলো গ্রামেরই ৯ জন, এখন আপনারা আবার কেনো? কেনো? কেনো? "

তার কথা শেষ হতে না হতেই থানার সামনের গাছটা কড়মড় করে ভেঙে পড়ল। কি হয়েছে দেখতে তারা যখন বাইরে এলো দেখলো পুরো গ্রামটা আজ থানা থেকে যেনো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কালো চাদরে। অস্বাভাবিক অন্ধকার। এবার রহিম বললো ,"এই মানিক ওটা কি?" তারা দেখলো সামনে একাধিক জ্বলন্ত নীল আলোর বিন্ধু, সেগুলো যেনো কাছে আসছে ,আরো কাছে। এবার তারা যা দেখলো তাতে তাদের মেরুদন্ড দিয়ে হিম শীতল ধারা বয়ে গেলো। ১০-২০ টা কঙ্কাল তাদের দিকে হেঁটে আসছে। রহিম এবার থর থর করে কাঁপছে, মানিকের চক্ষু স্থির। এবার সেই নীল আলোর বিন্দু গুলোর মধ্যে জ্বলে উঠলো একটা লাল আলোক বিন্দু । আর একটা ভয়ঙ্কর দেখতে কঙ্কাল বাকি কঙ্কাল দের ভিড় থেকে বেরি এলো। তার চোখ লাল ভাটার মত জ্বলছে ।এবার সে অট্ট হাসি হেসে বললো," লুট নিবি তোরা ! আমার লুট নিবি ! হা হা হা , আগেও পারিস ন্ এবা,ও না। ছাড়বো না ,তোদেরও টেনে নিয়ে যাবো মাটির ভিতর আমাদের সাথে, তার পর তোরাও আমাদের মত হয়ে যাবি। হা হা হা , ঠিক যেমন গ্রামের বাকিদের নিয়ে গেছি।"

কন্সটেবল সাহেবের ডাকে তাদের সম্বিত ফিরলে তারা ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে কাঁপতে থাকে। তাদের বুকের ভিতরটা ফেটে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড যেনো আজ ঘোড়ার থেকেও বেশি জোরে ছুটছে। এবার কন্সটেবল বললো,"যা করেছেন তা হয়েছে, এবার শুনুন আমি সেই পুরোহিত এর বংশধর যে

ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন। আমি একটু আধটু তান্ত্রিক জ্ঞান রাখি। যা বলছি করুন, নাহলে আপনাদের আমি আর বাঁচাতে পারবো না। আমাদের থানার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গ্রামের ভেতর শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে পৌঁছাতেই হবে। " এরা দিনের আলোই আপনাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবো না। চলুন আর সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না।

ইতিমধ্যে সমস্ত কঙ্কালদল একত্রে দরজা ধাক্কাতে শুরু করেছে। জানালা ধাক্কাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একসময় জানলাটা সশব্দে ভেঙে গেল। তারা ছুট লাগালো পিছনের দরজার দিকে ।ইতিমধ্যে সামনেরটা ভেঙে কঙ্কাল রঘু ঘরের ভেতর প্রবেশ করেছে ।তারা গ্রামের রাস্তায় দৌড় দিল পিছনের দরজা খুলে।

হটাৎ দেখলো সেই কঙ্কালের দল তাদের পিছু নিয়েছে। কিছু জন গাছ বেয়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে, তো কিছু মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তাদের ধরার চেষ্টা করছে। কিছক্ষনের মধ্যে কৃষ্ণ মন্দিরের চূড়া তারা দেখতে পেলচ। পন্ডিত জলদি মন্দিরের ভেতর ঢুকেই হলুদ আর সিন্দুরের একটা মিশ্রন হাতে নিয়ে কি একটা মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন।

রহিম ঝাঁপ দিয়ে মন্দিরে ঢুকতেই পণ্ডিত এর মন্ত্র পড়া শেষ হলো, আর তিনি সেই মন্ত্রপূতঃ হলুদ সিন্দুর ফুঁ দিয়ে সামনের দিকে উড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মন্দিরটা একটা হলুদ বলয় দিয়ে বেষ্টিইয় হলো। মানিক যখন মন্দিরে ঢুকতে গেল, হটাৎ তার পা-টা মাটি থেকে বেরিয়ে আসা দুটো কঙ্কালের হাত ধরে নিল। রহিম মানিকের হাত ধরে মন্দিরের ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করছে। ওদিকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো তৎকালীন বীভৎস মৃত ডাকাত সর্দার। পীতাম্বর চক্রের বাঁধন কাটিয়ে তারা কেউ মন্দিরের ভেতর ঢুকতে পারল না বটে, কিন্তু রহিমের একার ক্ষমতায় মানিক কে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কঙ্কাল সর্দার এর পৈশাচিক শক্তির সামনে রহিম আর পণ্ডিত গায়ের জোরে কিছুই করে উঠতে পারলো না। কঙ্কাল সর্দার তাকে টেনে নিয়ে গেল মাটির ভিতরে। রহিম এবার হাউমা উ করে কাঁন্দতে কাঁন্দতে ভেঙে পড়ল পন্ডিতকে ধরে কারণ এই কদিনেই মানিক এর সাথে তার একট ভালো বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ভোরের সকাল পর্যন্ত তারা একে অপরকে ধরে বসে থাকলো মন্দিরেই। সকালবেলা যখন সবকিছু শেষ হয়ে গেল তখন রহিম সদরে ফিরে এসে সবটা জানালো আর রেজিগনেশন দিল বেথুন সাহেবকে।

বাড়ি ফিরে প্রায় তিনমাস তার সময় লেগেছিল সুস্থ হতে। এখন তার বাবা তাকে জোর করে না চাকরির জন্য। কিন্তু দিলেরগঞ্জ গ্রামেতে তারপর ঠিক কি হয়েছে রহিমের জানা নেই। তবে পন্ডিত কে সে এখনো মনে মনে প্রচন্ড শ্রদ্ধা করে, তিনি যদি সেদিন তার প্রাণ না বাঁচাতেন কি যে হতো? অথচ কনস্টেবল বলে তাকে কতই না অপমান করেছিল তারা। কিন্তু রহিম এখন আরো বাধ্য আর ভালো ছেলে হয়ে গেছে, আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে কাজ করছে। কারন সে ভাল করেই জানে ধর্মের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের জীবন কারণ সেদিন যখন রহিম দৌড়াতে দৌড়াতে হোঁচট খায় তখন মানিক ফিরে এসে তাকে এক ধাক্কায় মন্দিরে ঠেলে দেয় আর তখনই ঘটে যায় সেই বিপত্তি। বলতে গেলে মানিক রহিমের জীবন বাঁচিয়ে ছিল সেদিন।

ডাকাত

বিশ্বজিৎ রায়

রাত ১০টা নাগাদ পবিত্রবাবুর বাড়িতে ডাকাত এলো। ঠিক যে সময় পবিত্রবাবু স্ত্রী কমলাকে নিয়ে একখানা সাদা কাগজে মাসিক আয়ব্যয়ের হিসাব কষছিলেন এবং ব্যয় সংকোচের মরিয়া প্রচেষ্টার একটি তাগাদা বিশেষত: কমলাদেবীর দিক থেকে বারেবারে ধেয়ে আসছিল - এই যেমন ধরুন কমলাদেবীর ইউরিক অ্যাসিডের ব্যাথা অনেকটাই কমেছে , অতএব এ মাসে সপ্তাহে দুদিন করে ইউরিক অ্যাসিডের ট্যাবলেট খেলেই চলবে সারা মাসের ট্যাবলেট কিনবার দরকার নেই, বা ধরুন গত মাসে পবিত্রবাবু স্ত্রীকে যে বলেছিলেন ভালো একটিও শাড়ী নেই বলে এ মাসে একখানা ভালো তাঁতের শাড়ী কিনে দেবেন কোনও অনুষ্ঠানে অংগ্রহণ করবার জন্য, তা আপাততঃ না হোলেও চলবে –এ রকম আর কি । ঠিক সেই সময়ের এ ঘটনা । ডাকাতদল এলো বলে দূর্ঘটনা, না কী ঘটনা তার উত্তর আমরা গল্পের শেষে গিয়ে পাব। চলুন, আপাততঃ আমরা গল্পে প্রবেশ করি।

ডাকাতদল ঘরে ঢুকে প্রথমেই যে কাজটি করলো তা হোলো বাড়ির ল্যান্ডলাইনটি দিল কেটে। ল্যান্ডলাইনটি কাটতে দেখে কমলাদেবী বললেন, “ ও লাইন কেটে কোনও লাভ নেই ।”

যে ছেলেটি লাইনটি কাটছিল সে বলল, “ কেন ? লাভ নেই কেন ? চালাকি না কি ? একদম জানে মেরে দেব। চুপচাপ খাটে বসে থাক।”

কমলাদেবী বললেন- “ সে মারতে হয় মারো, এ পরিস্থিতিতে আর বাঁধা দেব না , কিন্তু বলছি এ কারণে যে ঐ লাইনটি গত ছমাস ধরে ডেড হয়ে আছে।”

ছেলেটি বলল- “ তাই না কি – ডেড ! তাহলে মোবাইল যা আছে সব বের করে আমাকে দে।”

কমলাদেবী বললেন- “ একটি মোবাইল ড্রয়ারে আছে তবে সেও নষ্ট হয়ে আছে, সারাবার আর প্রয়োজন বোধ করি নি। ”

“ আচ্ছা কঞ্জুস বুড়াবুড়ি শালা। ল্যান্ডফোন রাখে না, মোবাইলও ব্যবহার করে না, শুধু টাকা জমায়। বলি, ফোন থাকলে রাতবিরেতে অসুস্থ হয়ে পরলে একটা ফোন ত কাওকে করতে পারিস । ঠিক আছে ক্যাস কত জমিয়েছিস ? আলমারির চাবিটা দে ”,তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো।

কমলাদেবী বালিশের তলা থেকে আলমারির চাবিটা বের করে ওদের হাতে দিয়ে বললেন,“আলমারিতে ৭২০০ টাকা আছে, আজই পেনশন তুলে এনেছে , এর বেশী আর কিছু নেই, ও টাকা তোমরা নিতে পারো।”

এতখন পবিত্রবাবু চেয়ারে বসে সব শুনছিলেন। কিন্তু ডাকাতদল তুইতুকারি ভাষায় কথা বলায় পবিত্রবাবু বললেন, “ তোমরা তুইতুকারি করছো কেন ? বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তোমাদের অভিভাবক কি শেখাই নি ?”

ডাকাতদলের মধ্যে থেকে একটি ছেলে ছুটে এসে পবিত্রবাবুকে সজোড়ে এক চড় বসিয়ে বললেন,“ তোর বাপ মা শেখাই নি আমাদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় ? ওসব পাঠ সব চুকিয়ে দিয়েছি বুঝলি । জ্ঞান দিবি না, যা বইয়ে লেখা আছে ওতেই থাক। মাষ্টার হওয়ার চেষ্টা করিস না। টাকা ছাড়া আর কি আছে ? কোথায় আছে বের কর । ”

পবিত্রবাবু বললেন, "টাকা ছাড়া আর যা পেয়েছি তা তো ভাগ করবার মত জিনিস নয়- সম্মান, মানুষের অকৃতিম ভালোবাসা আর সম্মান- ও তোমাদের দিব কি করে ?"

ডাকাতদলের মধ্যে থেকে একটি ছেলে বললো, " বাড়িতে আর কে কে আছে ?"

কমলাদেবী বললেন- " আমাদের একমাত্র সন্তান ।"

" কি করে ? তোদের সাথে থাকে না ?" ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো।

কমলাদেবী বললেন, " কোম্পানীতে চাকরি করে। আমেরিকায় থাকে। শুনেছি স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখেই রয়েছে। বাবা মার কাছে এর চেয়ে আর খুশির খবর কি হোতে পারে যে তার সন্তান সুখেই রয়েছে।"

একটি ছেলে বললো, " তাহলে তো আনেক টাকা তোদের ! যোগাযোগ আছে তো ? পাঠায় কিছু ?"

কমলাদেবী বললেন- " পাঠাতো ।"

"পাঠাতো ! এখন পাঠায় না ? কি পাঠাতো ? টাকা ?"

কমলাদেবী বললেন- " না। সপ্তাহে দু তিনটি করে এস এম এস।"

" কি ! এস এম এস ! কি লিখত এস এম এস-এ ? "

কমলাদেবী বললেন- "লিখতো, তোমরা বাড়িটা বিক্রি করে বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাও আর বাকি টাকাটা অতি শীঘ্র আমায় পাঠাও। তোমার বউমার জন্য একটি গাড়ি না কিনলেই নয়। এখানে গাড়ি না হোলে স্ট্যাটাস থাকে না।" "ছেলেটি রাগে কাঁপতে কাঁপতে কোমড় থেকে চেম্বার বের করে বললো- " স্ট্যাটাস ! শালাকে যদি হাতের কাছে পেতাম তো গাড়ি ওর..।!"

কমলাদেবী বললেন, " তাই একদিন ওর বাবা বললেন যে যখন কিছুই থাকলো না তখন এই ফোন দুটি রেখেই বা লাভ কি ? এই বলে ফোন দুটি আছাড় মেরে ভেঙে ফেললেন। তাই তো তোমাদের প্রথমেই বলেছিলাম ল্যান্ডফোনটির তার কেটে কোনও লাভ নেই। "

ছেলেগুলির মধ্যে থেকে একজন বিস্তর নেশা করেছিল। সে গিয়ে বিছানায় একটি বালিশ টেনে নিয়ে শুয়ে যন্ত্রনায় ছটপট করতে করতে কমলাদেবীকে বলল, " বড্ড মাথা ধরে আছে বড়মা"- এই বলে থেমে গেল। তারপর না জানি কি চিন্তা করে চোখ ছলছল অবস্থায় ব্যাথায় কাতর হয়ে 'মা, মা' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। কমলাদেবী পুত্র স্নেহে ছেলেটির কপাল টিপে দিতে লাগলেন।

ছেলেগুলির মধ্যে থেকে একটি ছেলের চোখ গিয়ে পরলো পবিত্রবাবুর বুকশেলফের দিকে। বুকশেলফেএ অনেক দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে। তার মধ্যে থেকে উইলাম শেক্সপিয়র এর উপরে লেখা একটি বই পড়তে লাগল, " When William Shakespeare first started writing, he had problems with two fires that almost wiped out his house....He had problems finding good actors, and later experienced writer's block⋯"

ছেলেটি হঠাৎ পড়া থামিয়ে দিয়ে পবিত্রবাবুর দিকে তাকিয়ে বললো, "এ সমস্ত বই বাড়িতে রাখেন ? আর পান্ডিত্য জাহির করেন। তাই তো এত দুর্দশা, বাস্তববাদী হোতে পারলেন না, সারা জীবন মানুষকে শুধু শিখিয়েই গেলেন , কি পেলেন ? বার্ধ্যকে একাকিকত্ব, একে অপরকে ঠকিয়ে ছলনা করে সুখে রাখবার বৃথা চেষ্টা, আর দশ কিলো চাল, হাফ কিলো তেল, সারা মাসের ৫০০ টাকার সব্জির ফর্দ ! সারা জীবন এত কিছু করেও মানুষ কি শিখেছে কিছু ?

কিচ্ছু না। ছিনিয়ে নিতে হয়, ছিনিয়ে নিতে হয়। এরা কেও কিছু দেবে না – শুধু মিথ্যা আশ্বাস। অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায়ের দ্বারা – এ সমাধান নয়, তবে সমাজে একটি কড়া বার্তা দেবারও প্রয়োজন আছে। আমি ত ভাবি উইলাম শেক্সপিয়র -এর মত মানুষদের জীবনে যখন এতই দুঃখ আসে তখন তাঁরা আমাদের মত ডাকাত হয়ে যায় না কেন ? ভালো খাপারের ডেফিনিশন অর্থের দ্বার ডেফিনিশন অর্থের দ্বারা হয় না। যার অর্থ আছে তাঁর সব আছে – সম্মান, পাওয়ার , প্রতিষ্ঠা- সব সব।" এই বলে পবিত্রবাবুর দিকে ধেয়ে গেল।

কমলাদেবী ভয়ে আঁতকে উঠে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, " ওকে আর মেরো না তোমরা, বাঁচবে না। হার্টের পেশেন্ট। অপারেশন দরকার। কিছু টাকা প্রোমোটার দেবে বলেছে । টাকাটা পেলেই অপারেশনটা করাবো। ছেলেটি বললো ," বাড়ি তাহলে সত্যি সত্যিই বিক্রি করে দেবেন ? তারপর, তারপর থাকবেন কোথায় ?

কমলাদেবী বললেন, "জানি না।"

ছেলেটি বললো, "শেষে গিয়ে প্রোমোটারের খপ্পরে পরলেন ! প্রোমোটার কত টাকা দেবে বলেছে ? অপারেশনের জন্য কত টাকা দরকার ?"

কমলাদেবী বললেন- " দুই লাখ।"

কিছুক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ হয় রইলো। কমলাদেবী বললেন- " তোমাদের সকলের মুখ শুকনো দেখছি। কিছু খেয়েছো ? ঘরে বিশেষ কিছু নেই। ডিম রয়েছে। অমলেট আর চা করে দেই তোমাদের। খাবে ?"

একজন বলে উঠলো- "তাই করুন , খিয়ে পেয়েছে। "

কমলাদেবী সকলের জন্য অমলেট আর চা করে নিয়ে এলে সকলেই খেলো।

ভোর ৪টে । সকলে পবিত্রবাবু এবং কমলাদেবীকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

কমলাদেবী পবিত্রবাবুকে বললেন, " রাত তো শেষ। এবার তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। নইলে আরো অসুস্থ হয়ে পরবে।"

পবিত্রবাবু বিছানায় উঠে ছেলেটি যে বালিশ নিয়ে এতখন শুয়েছিল সেই বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পরলেন। কমলাদেবীও শুয়ে পরলেন। কিন্তু পবিত্রবাবু বালিশে মাথা রেখে অনুভব করলেন যে, অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ বালিশটি অনেক উচু। এত উচু কেন ? এই মনে করে বালিশের তলায় হাত দিতেই পবিত্রবাবু হতবাক ! ধড়ফড়িয়ে উঠে স্ত্রীকে ডেকে বললেন – " দেখো !"

কমলাদেবী নির্বাক !

বালিশের তলা থেকে বেরিয়ে এলো দুই হাজার টাকার একশোটি নোটের একটি বান্ডিল - দুই লক্ষ টাকা ।ডাকাতেরা রেখে গেছে তাঁদের জন্য।

পবিত্রবাবু বললেন- "ডাকাতের মধ্যে যদি এত মানবিকতা থাকে, তবে আমাদের মধ্যে নেই কেন ? হয়ত আমরা আমাদের সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি নি ,কমলা"।

কমলাদেবী বললেন, " তা নয় তোমার শিক্ষার নির্যাস গ্রহণ করবার মত উপযুক্ত তোমার সন্তান ছিল না। এও তোমার মত কোনও এক পবিত্রবাবুই ছিলেন যার শিক্ষা আজ এই ছেলেগুলি দেরীতে হোলেও গ্রহণ করতে পেরেছে। হয়ত এদের মত আমাদের সন্তানও একদিন প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। পবিত্রবাবুদের শিক্ষা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। "

পবিত্রবাবু বললেন- "পুলিশকে একটা খবর দেই । ডাকাতেরা টাকা রেখে গেছে যে।"

কমলাদেবী বললেন- " দরকার নেই। ভগবান ওদের পাঠিয়েছিল আমাদের সন্তানের অভাব মেটাতে। যা আজ আমার গর্ভের সন্তানের করা উচিত ছিল ওরা আজ তা করে গেল। তোমার চিকিৎসার জন্যই ওরা ও টাকা রেখে গেছে। প্রতিটা ছেলেই শিক্ষিত। আজ অসম , স্বার্থন্বেষী সমাজের শিকার ওরা । ভগবান ওদের মঙ্গল করুক। আর হ্যাঁ, কাল একবার প্রোমোটারকে বলে দিও- বাড়িটা আমরা বিক্রি করছি না।"

সকাল ৭টা। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল- " বাড়িতে কে আছেন ? দরজা খুলুন।"

পবিত্রবাবু ঘরের ভিতর থেকেই বললেন- " কে ? কাকে চাই ?"

ওপার থেকে বজ্রকন্ঠ ভেসে এলো, " আমি ফারহান

আখতার, এস আই। আমরা বালুরঘাট পুলিশ ষ্টেশন থেকে এসেছি।"

(সমাপ্ত)

SHADWAL PATRIKA

NRIPENDRA NARAYAN BHATTACHARYA

COVER DESIGNING & ORNAMENTATION :

SOUKARSHA BHATTACHARYA

SHIBJAGNA ROAD, KHAGRABARI,

COOCHBEHAR

736101